পঞ্চপুষ্প

পঞ্চপুষ্প

শেফালী দাস

পঞ্চপুষ্প
শেফালী দাস
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ২০০ টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৯৮-৯-৮

ISBN : 978-984-96898-9-8

Poncho Pushpo, Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Boimela-2024, Copy Right: writer, Cover design & Book Setup: Chayanir Computer, Price: 200/- (Two Hundred Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১৯১৩২১৪

উ ৎ স র্গ

প্রিয় অনুজ কল্যাণ বিহারী দাসকে

ভূমিকা

‘ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল, সহস্র বিস্মৃতি রাশি
প্রত্যহ যেতেছে ভাসি-
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ’-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের একটি সহজবোধ্য শাখা হচ্ছে ছোটগল্প। লেখকের সত্তা নিংড়ে বেরিয়ে আসে ছোটগল্প। শেফালী দাস একজন সুলেখক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. সম্পন্ন করে কর্মজীবনে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন।
অবসরে এসে তিনি কলম ধরেছেন। প্রৌঢ়ত্বে এসেও তার কলম থেমে নেই। আশি উর্ধ্ব বয়সে এসে তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেছেন একেকটি গল্পের জমিন। একজন লেখক শুধু মনোরঞ্জনের জন্য লিখে থাকেন না, তাঁর লেখনী সমাজের বিবেককে জাগ্রত করে। শেফালী দাস সে কাজটিই করে যাচ্ছেন সুনিপুণভাবে। তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে স্নেহ পরায়ণতা।
তাঁর পঞ্চপুষ্প নামক গ্রন্থটিতে পাঁচটি ভিন্ন আঙ্গিকের গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পে মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম উচ্চকিত হয়েছে। মাতৃস্নেহ যেন তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। প্রতিটি গল্পের চমৎকার শব্দ বুনন।
‘সুমতি’ ও ‘আপনার চেয়ে আপন যেজন’ গল্পে মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ‘অভিনন্দন অভি’ গল্পে এক শিশুর বুদ্ধিমত্তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
‘নয়নতারা’ গল্পে বিড়ালের প্রতি পরিবারের সবার স্নেহ পড়েছে।
‘কোন কাননের ফুল’ গল্পে সুতপা লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে পুরুষের প্রতি তার ভ্রান্ত ধারণা প্রেমে রূপ নিয়েছে। ‘পঞ্চপুষ্প’ গ্রন্থটি পাঠকনন্দিত হলে লেখিকার শ্রম সার্থক হবে।

সূচি

১. সুমতি---
২. আপনার চেয়ে আপন যেজন---
৩. অভিনন্দন অভি---
৪. নয়নতারা--
৫. কোন কাননের ফুল--

সুমতি

অপরাহ্নে ইজিচেয়ারে বসে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ছিল সুমতি। কি ভাবতে ভাবতে সে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন কাউকে খুঁজছিল। আস্তে আস্তে উঠে বাড়ির সামনের বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল দুই আড়াই বছরের কালো একটি ছেলে মাটিতে বসে খেলছে।

সুমতি ওর কাছে যেয়ে ধুলোসহ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলতে লাগল, এই তুই আমার ছেলে হবি? বল, আমার কাছে থাকবি?

ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সুমতি যখন আদর করছে তখন সুমতির ভাতিজার মেয়ে রূপা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বলল: আম্মা, মা তোমাকে ডাকছে, ভিতরে এসো।

সুমতি কিছুটা রাগ করে উত্তেজিত হয়ে বলল: যাচ্ছি, তুই আমার কৃষ্ণকে বাড়ির ভিতর নিয়ে আয়, ওর আজ জন্মদিন, আমি পায়েস রান্না করে রেখেছি। এ কথা শুনে রূপা খিলখিল হেসে বল্ল, এই তোমার রোগ, কি বলছ, কি করছ তা নিজেও জানো না।

ছোট্ট একটি শহর। নাম তার বাসুদেবগঞ্জ। ঐ শহরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে একটা খাল। জানা যায় ওখানকার স্থানীয় জমিদার এই খালটি খনন করে দিয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে জমিদার স্কুল, কলেজ তৈরি করে দিয়েছে। ঐ সুবাদে জেলায় শিক্ষার প্রসারও হয়েছে প্রচুর।

সুমতি দত্তকে প্রায় সবাই দিদি বলে ডাকে, কারণ তিনি স্থানীয় শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। উনাকে দেখে মনে হয় উনি যেন শিক্ষক হয়েই জন্মেছেন। সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহের চোখে দেখেন।

সুমতির বাবা বৃদ্ধ হয়েছে। চাকরি নেই, বেসরকারি চাকরি করতেন বলে পেনশনও পান না। এদিকে অনেক ভাইবোন নিয়ে কি করে সংসার চালাবে! শিক্ষক হিসাবে কতইবা বেতন সে পায়। বড় ভাইরা চলে গেছে ভারতে, ওখান থেকে তারা কিছু করতে পারছে না। এতবড় একটা সংসারের পরিচালক এই একরত্তি মেয়েটি। সবে পড়াশুনা শেষ করেই পরিবারের সবার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে। এছাড়াও উটকো ঝামেলাও আছে। তখনকার দিনে প্রতিদিন আত্মীয় স্বজন শহরে কোনো না কোনো কাজে আসতো এবং প্রয়োজনে থেকেও যেত। সে সময়ের কম লোকই শহরে থাকত, গ্রামে থাকতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। দিনের পর দিন সংসারের খরচ বেড়েই যাচ্ছে, ভাইবোনেরা বড় হচ্ছে স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে, তাই খরচও দ্বিগুণ বেড়েছে। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? টাকার গাছ তো ওর হাতে নেই। তাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সুমতি!

সুমতির মা সরমা দেবীও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। মেয়ের কষ্টের কথা ভেবে মা কিন্তু তিনি কি করবেন? সুমতি উপায় বের করে ফেলল, টিউশন করলে আয় বাড়বে। মা বললেন, মারে তোর কষ্ট আর সহ্য হয় না। মেয়ে হেসে উত্তর দিল, "কেন না, তুমি কি আমাদের জন্য একটুও কষ্ট করনি, না হয় তার কিছুটা প্রতিদান দিচ্ছি।"

মেয়ের কথা শুনে মা মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রুসংবরণ করল।

টিউশন করতে সুমতির কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ পাড়ার সবাই তার সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য খুবই ভালোবাসতো। রাতেও যদি টিউশন করতে যেত, তাহলে ছাত্রীর বাড়ির লোকেরাই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিত। সুমতি যেমন ওদের ছোট ভাইবোনের মত স্নেহ দিয়ে, আদর দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে যত্ন করে পড়াত। তেমনি ওরাও খুব শ্রদ্ধা ভরে ওকে ভালোবাসতো, ছাত্রীরা যেমন তাকে ভয় পেত, তেমনি তাকে ভালোওবাসতো।

সুমতি স্কুলের টিফিন চার্জের দায়িত্বে ছিল। স্কুলের টিফিন তৈরি হতো। সেজন্য তাকে ক্লাসে বসার আগেই স্কুলে যেতে হতো। একদিন স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে এক ছাত্রী দৌড়ে এসে দিদির ভ্যানিটি ব্যাগে কি যেন ঢুকিয়ে দিল আর কানে কানে কি যেন বলে দৌড়ে চলে গেল। কানে সুরসুরি লাগাতে দিদি শুনতেই পায়নি কি বলেছিল। সকালে মেয়েরা স্কুলেই স্যারের কাছে টিউশন করত।

এ ঘটনাটি নিয়ে তোলপাড় শুরু করল সেই শিক্ষক। ক্লাসে এসে মেয়েটিকে চার্জ করল, কেন তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে দিদির কাছে গেলে? মেয়েটি তো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তিনি আবার বললেন, কি এমন গোপন কথা যা দিদিকে কানে কানে বললে তা আমাকে বলতে পারবে না কেন? উনি তোমাদের ম্যাডাম, আমিও তোমাদের স্যার। উনার মধ্যে তোমরা কি পেয়েছ? বলে ধমকাতে লাগলেন। মেয়েটি কেঁদে কেঁদে বলল: স্যার এমন কিছু কথা আছে যা মাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা যায় কিন্তু বাবাকে বলা যায় না, কথাটা শুনে স্যার যেন একেবারে চুপ হয়ে গেল।

এ ঘটনাটি আবার দিদি জানত না। স্কুলেরই অন্য একজন শিক্ষিকা এসে দিদিকে বলল। দিদি শুনে দুঃখ পেলো কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না। দিদি অতি সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই দিদিকে পছন্দ করত। কোনো সমস্যায় পরলে সুমতির কাছে সমস্যার সমাধান চাইতো। সেও এমনভাবে কাজ করতে যেন সেজন্যই সে দিদি। মাঝে মাঝে ময়নাদেবী খুবই বিরক্ত হতেন, কারণ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর চেয়ে অনেক মূল্যবান কাজ তার আছে।

মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন, আমরা অন্যায় করছি, এই মেয়ে কোথায় সংসার করবে। স্বামী- সন্তান নিয়ে সুখে থাকবে, তা না করে আমাদের সুখ চিন্তায় মেয়ে সর্বদা ব্যস্ত।

এমনিভাবে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুমতির স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি, মেঘে মেঘে বয়সটাও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। ভাইবোনদের পড়াশোনা শেষ হয়েছে, পায়ে পায়ে সবাই একটু একটু করে জীবন যাত্রায় এগিয়েছে। তারা আজ সবাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুমতি জীবন সায়াহ্নে এসে ভাইবোনদের সাফল্য দেখে খুবই খুশী হয়েছে। এটাই তো সে চেয়েছিল।

হঠাৎ করে দিদির জীবনে যেন কেমন ছন্দপতন ঘটল। একদিন এক ভাড়াটে এসে ওদের দোতলায় ভাড়া নিয়ে উঠল। বড় সংসার। ১০/১২ জন লোক নিয়ে ওদের সংসার, অমায়িক ওদের মা। সুমতি কৌতূহলবশত ওদের দেখতে দোতলায় গেল। ভাড়াটিয়ার ছোট ভাইটির নাম গোবিন্দ। সে এসে সুমতিকে প্রণাম করে বলল: দিদি ভাল আছ তো?

সুমতি অবাক হয়ে ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার দিদি কি করে জানলে? মামীও তো হতে পারতাম, লজ্জা পেয়ে ছেলেটি বলল- হ্যাঁ তা পারতে, কিন্তু তবুও তুমি আমার দিদি। সুমতি আদরের সুরে বলল: প্রথম দেখাতে এত পাকামো দেখাতে হবে না।

এরপর থেকে গোবিন্দ সুমতির এত কাছাকাছি আসতে শুরু করল যে সত্যিই সুমতি ওর আপন দিদি। আর সুমতিও এত স্নেহ পরায়ণ যে ওকে ব্যথা দিতে চায়নি, আরও বেশি করে ছোট ভাইটিকে আদরে যত্নে সোহাগে কাছে টেনে নিত। সুমতির অন্তরে স্নেহ ছিল। দয়ামায়া ছিল। দিদি গোবিন্দকে না দেখলে এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। গোবিন্দদের কাপড়ের ব্যবসা রমরমা। সেজন্য ওদের সবার অহংকারও প্রচুর। শহরে গোবিন্দদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। অল্পদিনের জন্য সুমতিদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, বাড়ি তৈরি হলেই ওরা ওদের নিজস্ব বাড়িতে চলে যাবে। একথাটা সুমতি ভাবতেই পারে না। এমনিতেই সুমতি একটু আবেগপ্রবণ, উপরন্তু ভাইদেরকে খুবই ভালোবাসতো।

গোবিন্দের বয়স ৪০/৫০ বছর হবে এতবড় ছেলে হয়েও দিদির আদর পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত। একদিন দিদিকে বলেই ফেলল- দিদি, তোমার সঙ্গে এত পরে কেন দেখা হলো? আগে কেন হলো না?

সুমতি হেসে বলল: আগে দেখা হলে কি হতো?

- কি আবার হতো? এই যে তোমার কাছে কত শেখার আছে। আগে পরিচয় হলে আরও বেশি শিখতে পারতাম, জানতে পারতাম। দু' ভাই বোনের এত খাতির ভালোবাসা দেখে মনে হতো একই মায়ের পেটের ওরা দুজন।

এর মধ্যে গোবিন্দদের বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, ওরা শীঘ্রই নতুন বাড়িতে চলে যাবে। সব গোছগাছ হচ্ছে। সুমতি কিছুতেই তার মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না। তবুও যেতে দিতে হবে। গোবিন্দের মা সুমতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: মনখারাপ করতে আছে মা? মন খারাপ করো না। তুমি মাঝে মাঝে তোমার ভাইকে দেখতে যাবে, গোবিন্দও আসবে।

ওরা সুমতিদের বাড়ি থেকে নিজেদের নতুন বাড়ি কলেজ পাড়ায় চলে যাওয়ার পরের দিনই সুমতি- মা- মা- বলে ডাকতে ডাকতে ভিতরে ঢুকল। গোবিন্দ আনন্দে চিৎকার করে বলল- মা, দিদি এসেছে। মা খুব খুশী হয়ে সুমতির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল- আজ এ বেলা থেকে সন্ধ্যায় যাবে, তোমার ভাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

গোবিন্দ মহাখুশী দিদিকে পেয়ে। সুমতি বলল: দেখ না গোবিন্দ, তোকে না দেখে থাকতেই পারি না। তাই সাত সকালে তাড়াতাড়ি চলে এলাম আমার ছোট্ট সোনা ভাই এর কাছে।

সুমতির সংসার ছোট হয়েছে। বোনদের বিয়ে হয়েছে ওরা শ্বশুরবাড়ি। ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে চাকরি ইতোমধ্যে মা- বাবা দুজনেই গত হয়েছেন। সুমতির ছোট্ট সংসারে পড়ে আছে সুমতির ছোট ভাইয়ের ছেলে বিজয়। ছোট বেলা থেকেই বিজয় সুমতির কাছে থাকে। সে সুমতিকে মা মনি বলে ডাকে এবং মায়ের মত শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। সুমতিও বিজয়কে নিজের সন্তানের মত আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করেছে।

বৃদ্ধ বয়সে দুঃখের সীমা পার হতে না হতেই সুমতির জটিল রোগ ক্যান্সার ধরা পড়ল। রোগের কথা শুনে বিজয় মুষড়ে পড়ল কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শত অস্থিরতার মধ্যে বিজয় নিজের মন স্থির করে মা-মনিকে ভারতে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

বর্ষাকাল। আকাশভর্তি মেঘ। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে চিকিৎসার জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে বাসে করে রওনা হলো এবং ওখানে বড় একটি হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হলো। সুমতির অসম্ভব মনোবল, ঈশ্বরের অপার কৃপায় সুমতি সুস্থ হয়ে বাসুদেবগঞ্জে ফিরে এলো, বাড়িতে ঢুকতেই দেখে যে গোবিন্দ ও তার বন্ধু বান্ধবরা দাঁড়িয়ে আছে। সুমতি এত দুর্বল ছিল যে সিঁড়িতে পা লেগে পড়ে গেল। তখনই মনে মনে ভাবতে লাগল আমার দিদি ভাল হয়ে ফিরে এসেছে। এটাই ঈশ্বরের অপার করুণা। বাড়ির সবার আদর যত্নে সুমতি আস্তে আস্তে ভালো হয়ে ওঠে। আগের মত স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং ইতোমধ্যে সুমতির প্রিয় কানাই বৈরাগী এসে দিদিকে দেখে বলল, দিদি তুমি আমার গোপালের আশীর্বাদে ভাল হয়েছ। তোমার নামে গোপালের পূজা দিয়েছি।

গোবিন্দের মা এসে বলল- ঈশ্বরের কৃপায় তুমি সুস্থ হয়েছো। তুমি তোমার ভাইদের যেভাবে আগলে রাখ। তুমি সুস্থ না থাকলে কে দেখবে ওদের? সুস্থ হয়ে সুমতি মাঝে মাঝে ওদের দোকানে বসত অবসর সময় কাটানোর জন্য।

সুমতি মোটামুটি সুস্থ। এরমধ্যে রাখি পূর্ণিমাতে ছোট ভাই গোবিন্দকে হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে আশীর্বাদ ও আনন্দ উল্লাস করেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতেই গোবিন্দের জন্মদিন। ঐদিনও সুমতি বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে, পায়েস খাওয়ায়ে ও উপহার দিয়ে অনেক অনেক আশীর্বাদ করে দিবসটি পালন করে। এরপর আসে দুর্গা পূজা। পূজার সময় গোবিন্দ তার মায়ের কথাতেই দিদিকে শাড়ি কিনে দিয়েছে এবং দিদিও ওকে আশীর্বাদ স্বরূপ উপহার দিয়েছে।

বেশ ভালই কাটছিল দিনগুলো। ডাক্তার সুমতিকে সর্বদা হাসি খুশিভাবে থাকতে বলেছে। ভাই বোন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটছিল সুমতির। হঠাৎ করে কোথা থেকে কি হয়ে গেল সুমতি কিছুতেই তা বুঝতে পারল না। একদিন ঝকঝকে এক সুন্দর সকালে গোবিন্দের মা সুমতিকে ফোন করে বলল, মা একটা কথা বলি, তুমি কিছু মনে করবে না তো?

সুমতি ভেবেই পায় না এমন কি কথা বলবে যাতে সে কিছু মনে করতে পারে। হ্যাঁ মা বল, মনে করার কি আছে। মা বলল, তুমি আমার মেয়ের মত কিচ্ছু মনে করবে না কিন্তু। তুমি যে আমার ছেলেদের ছোট ভাই এর মত ভালোবাসো, তাই তুমি নিশ্চয়ই চাইবে ওদের কোন ক্ষতি না হোক। তুমি দোকানে বসলে ক্রেতারা নানা কিছু ভাবে। এতে বেচাকেনার ক্ষতি হয় এবং ব্যবসারও ক্ষতি হয়।

মায়ের মুখে একথা শুনে সুমতি অবাক হয়ে নির্বাক নিশ্চল মূর্তির মত মেঝেতেই দাঁড়িয়ে থাকে। এটা মায়ের কথা তা কিছুতেই সুমতির বিশ্বাস হচ্ছিল না। যে মা দু'দিন আগে ভাইদের দেখেশুনে ও আগলে রাখতে বলেছিল। সেই মা আজ একি বলছে! সুমতির মাথা ঘুরে গেল। মায়ের এই কথাগুলো সুমতি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। ছোট ভাইকে আদর করা, ভালোবাসা ও স্নেহ করা কি অন্যায়? কেন এমন হলো? কিছুতেই সুমতি বুঝতে পারছে না।

শক্ত মনোবল যার। সে যেন কেমন করে আস্তে আস্তে মনোবল হারিয়ে ফেলছে। আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথা বলছে। রাস্তায় বের হয়ে লোকদের বলছে, আমার ছেলেকে দেখেছ? দাও না খুঁজে!

লোকেরা বলত তোমার কি ছেলে আছে?

সুমতি রেগে বলত, যা বাঁদরের দল তোরা কি জানিস।

আবার দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে কাঁদতো।

এইভাবে চলছিল সুমতির জীবন। ওর সমস্ত আদর স্নেহ একে জমা পড়েছে সন্তান স্পৃহায়। সবাই ভাবে এই বুঝি আমার ছেলেটা হারিয়ে গেল.....

এই.... এই..... যাসনে বাবা, ফিরে আয়.... বলতে বলতে ছুটে রাস্তার দিকে চলে যেত সুমতি।

কেন এমন হলো কেউ বুঝতে পারছে না। দিদির কষ্ট দেখে সবাই মর্মাহত। ভ্রাতৃ স্নেহে যে ছেলেটাকে এত কাছে টেনে নিয়েছিল তার সঙ্গে ছিল না তার আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক। আত্মার টানই সুমতির কাছে বড় হয়ে গেল!

একটা সুরেলা রবীন্দ্র সঙ্গীত হঠাৎ গোবিন্দের কানে ত্রাস বেসুরো হয়ে উঠল। তাই সে হকচকিত হয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। কিছু বুঝতে না পেরে এগিয়ে গেল। তখন আস্তে আস্তে চোখের সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল এবং চেইদোলার একটি বাঁশ বিজয়ের কাঁধে দেখে ওর মনটা হুহু করে উঠল। জিজ্ঞেস করল, কাকে নিয়ে যাচ্ছ?' বিজয় চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল: সেই লোকগো, যে সবাইকে আপন করে নিত, অনেক আদর স্নেহ দিয়ে কাছে টেনে নিত, তোমাদের দিদিগো, আমার মামনি! এসো, ধরো, তোমার ভালো লাগবে এইভাবে যে ঋণের বোঝাটা তোমার কিছু কমবে।

গোবিন্দ ওখান থেকে একপাও নড়তে পারল না। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটির সঙ্গে সেও যেন কেমন নিশ্চল নিথর হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। করুণ সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাশবহনকারীরা শ্মশানের দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপনার চেয়ে আপন যেজন

মাঝরাতে হঠাৎ করেই গোপালের ঘুম ভেঙে যায়। উঠেই একবারে মা সবিতাকে ডাকতে ডাকতে মায়ের ঘরে চলে আসে। সবিতা আচমকা ডাক শুনে ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠেই চিৎকার দিয়ে উঠে, কি হয়েছে বাবা? আয় আমার কাছে আয়।' গোপাল দৌড়ে মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে লাগল।

মা আমার কিছু ভাল লাগছে না।

কেমন করে লাগবে? যা বাবা। সব ভুলে যা।

গোপালও মাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে শান্তি খুঁজতে লাগল। মা বলল, আমি আছিতো, তোর কীসের চিন্তা, কীসের ভয়, ওঠ- ওঠ বলে সবিতা ছেলের চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাকে চাদর গায় দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। গোপালও আদরের কাঙাল, তাই মায়ের সান্নিধ্য আরও বেশি করে সে আকাঙ্ক্ষা করছে।

ছেলেতো ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু মায়ের কিছুতেই ঘুম আসছে না। বারবার মনে হচ্ছে কেন এমন হলো। আমিতো সব সন্তানকেই অতি আপন ভেবে স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছি।

কোন এক সকালে ঘুম থেকে উঠে সবিতা বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেমন করে আছাড় পড়ল। ভাগ্যিস কাছেই ছিল সবিতার স্বামী দেবজ্যোতি রায়। সে দৌড়ে গিয়ে সবিতাকে তুলতে গেল, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না, পা দুটি গড়িয়ে আগেই পড়ে গিয়েছিল, আর পুরো দেহটা ওর হাতেই ছিল। তাই সবিতার তেমন কিছু না হলেও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সবাই ধরাধরি করে শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিল।

ডাক্তার এলো, আনন্দের সংবাদ দিল- সবিতা মা হতে চলেছে। একটু লজ্জা পেয়ে দেবজ্যোতি ঘর হতে বের হয়ে গেল। মাবাবা আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বাড়ির অন্যদের মিষ্টি আনতে বলল। সেদিন বাড়িতে কি যে আনন্দ। এত আনন্দ যেন কোনদিনও হয়নি।

ওদের দোতলা বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, আর পিছনে সবজি ও ফলের বাগান। ঐ সন্ধ্যার পরে দেবজ্যোতি সবিতাকে নিয়ে ফুটফুটে জোৎস্না রাতে বাগানে বেড়াতে গেল। শুধু দু'জনে। একটা বেঞ্চে দু'জনে এত সংলগ্ন, এত কাছাকাছি কিন্তু আবেগে এতই আপ্লুত যে তাদের মুখে কোনো কথা সরছে না।

ফেরার সময় দেবজ্যোতি বলল, আজকের দিনটা তোমার কেমন লাগছে সবু?

সবিতা কিছুই বলতে পারল না হয়তো কত কি ভাবছে।

দেবজ্যোতি আরও উৎফুল্ল হয়ে বলল, কি আর ভাবছে এ পার্ট উনারা অনেক আগেই চুকিয়ে দিয়ে এসেছে।

সবিতার জীবন সুখেই কাটছিল, প্রথম সন্তান সাধন চন্দ্র রায়। দ্বিতীয় সন্তান রাধারানী রায় বাবার গায়ের কালো রং পেয়েছে সাধন আর মায়ের মত অপরূপ সুন্দরী হয়েছে রাধারানী। এতরূপ সচরাচর সাধারণ পরিবারে দেখা যায় না।

মা নিজের ইচ্ছেমত পড়াশুনা করতে পারেনি। তাই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার কোনো ত্রুটি রাখে নাই। মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম।

লেখাপড়া নিজে তেমন জানতো না। তবুও তার কোনো দুঃখ ছিল না। কারণ তার স্বামী দেবজ্যোতির ব্যবহারে, ভালোবাসায় সে মুগ্ধ। কোনো রাগ নেই, সদা হাস্যমুখে সমস্যার সমাধান করে দিতো। জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে অতি সহজ ভাষায় হেসে হেসে বলত 'ধৈর্য ধরো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এতোব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। স্বামীর বাক্যে সবিতাকে কখনও রাগ করতে বা জেদ করতে কেউ দেখেনি। দু'জনের মধ্যে এত মিল সচরাচার মেলা ভার।

শ্বশুর-শাশুড়ির আদর যত্ন ও ভালোবাসায় সুন্দরভাবে সবিতার সংসার চলছে। ওঁদের একমাত্র সন্তান দেবজ্যোতি। সত্যিই ওঁদের ছেলে দেবতার মত। কথা-বার্তা, চালচলন, সামাজিকতা, সব কিছুতেই যেন অনন্য। মা- বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা কোনোটারই তার কমতি ছিল না। তা না হলে কি হবে বিধি যে বাম। সবিতার স্বামী ভাগ্য যে সংকীর্ণ। সংসারের চড়াই উৎরাই পার হতে না হতেই হঠাৎ করে সবিতার শ্বশুর মারা গেল। তখন সবিতার প্রথম সন্তানের বয়স ২ বছর। এ শোক কাটতে না কাটতেই শাশুড়িও একদিন গত হলো। রায়বাড়ির এমন পরিস্থিতিতে দেবজ্যোতি ও সবিতা দুজনেই একেবারে মুষড়ে পড়ল। সংসারের দিকে ওদের নজর নেই। বাচ্চাদের প্রতি আদর যত্ন নেই। এমতাবস্থায় দেবজ্যোতি শোককে ভুলতে চেষ্টা করল এবং সংসারে মনোযোগী হলো। কারণ এরকম হলে চলবে না। বিপদে ধৈর্য হারা হলে হবে না।

পৃথিবীতে কোন কাজই থেমে থাকে না, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সে প্রতিনিয়ত চলতেই থাকে। ব্যবসা, জমিজমা, সংসার সবকিছু নিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল দেবজ্যোতির পরিবার। বড় ছেলে সাধন ৪র্থ শ্রেণিতে স্কুলে পড়ে, মেয়েটা সবে বই ধরেছে।

শোককে তো আর চিরকাল বুকে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয় তাই মানুষ সুখই চায়, শান্তিতে থাকতে চায়, মানুষ শান্তি প্রত্যাশী। সবিতা শান্তির প্রত্যাশায় থাকতে থাকতে এমন বিপদে পড়ল, যে বিপদ সর্বনাশা বিপদ। হঠাৎ একদিন সবিতার জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এলো। রাধারানীর জন্মদিন পালন করার জন্য বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে ছোট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন চলে গেছে। ওরাও কাজ সেরে শুয়ে পড়েছে। শেষরাতে দেবজ্যোতি কেমন যেন অসুস্থ বোধ করল। বাড়িতে চাকর বাকর ছাড়া কেউ নেই, তাই ওদের ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। ডাক্তারকে আর সুযোগ দেয়নি দেবজ্যোতি। ডাক্তার পৌঁছার আগেই চলে গেল। বাড়িতে শোকের মাতম শুরু হলো।

সবিতার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে। সে লেখাপড়া তেমন জানে না, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই বাবা- মা সুপুরুষ, সচ্চরিত্র ও বিত্তবান পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দেয়। সবিতা অপূর্ব সুন্দরী, মাথাভর্তি কালো চুল কোমর ছেড়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। টকটকে গায়ের রং, উন্নত নাক, হরিণের চোখের মত টানা টানা চোখ দু'টি। তাইতো পাত্রপক্ষ এত সুন্দরী মেয়েকে দেখা মাত্র পুত্রবধূ করে আনলো।

শ্বশুরবাড়ি এসে সবিতা মহামুশকিলে পড়ল। কারণ সাংসারিক কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই, উপরন্তু অল্প বয়স। কিন্তু কোন কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না কারণ শাশুড়ি মা ছিলেন খুবই বিবেচক। সবিতার কিসে সুবিধা, সে কি করতে পারে, কি করতে ভালোবাসে, কি করতে পারে না সব দিকে সে লক্ষ্য রেখে সংসার পরিচালনা করে। কথায় আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। সবিতারও খুব আগ্রহ যে সে শাশুড়ি মার কাছ থেকে হাতে কলমে শিক্ষা নিয়ে সুগৃহিণী হবে ।

প্রায় ২৫ বছর সবিতার সাংসারিক জীবনে এত বিপর্যয় দেখে সে আর ঠিক থাকতে পারছে না। সুন্দর সুখের জীবনে কেমন করে যেন ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু সে তো হেরে যাওয়ার মেয়ে নয়, আপ্রাণ চেষ্টা করে ছেলে মেয়েদের মানুষ করছে ও সংসার ঠিক রাখছে। সবিতা ঠিক করল, কলকাতা থেকে জ্যাঠাত ভাই সুরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে সন্দ্বীপ জেলার নবদ্বীপে তীর্থ করতে যাবে। ছেলে মেয়েকে মায়ের কাছে রেখে নবদ্বীপ চলে গেল। ছিমছাম সুন্দর একটি বাড়ি ভাগ করে দু' ভাই-বোন সেখানে থাকতে লাগল, আর কবে কোথায় কোন মন্দিরে যাবে ভ্রমণ গাইড দেখে তার প্ল্যান করে নিল।

সবিতা তার দাদা সুরঞ্জনের সঙ্গে প্রতিদিন মন্দিরে যায়, দেবতার পূজা দেয়, আর সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। সবিতার মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার সংসারের প্রতি তেমন মায়া নেই, যত ভক্তি শ্রদ্ধা সব দেবতার উপর, আর স্নেহ ভালোবাসা সন্তানদের প্রতি।

যে বাড়িটি সবিতা ভাড়া নিয়েছে, সেখানে ওরা থাকে, রান্নাবান্না করে খায় বাকী সময় মন্দির দর্শনে কাটিয়ে দেয়। সবিতা চুল কেটে ফেলেছে। গহনা পরিত্যাগ করেছে, সাদা থান কাপড় পরে থাকে। সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ভাব গ্রহণ করেছে। তা করলে কি হবে। স্নেহমায়া মমতা এগুলো কি কোন মা কখনও ত্যাগ করতে পারে?

একদিন ঘুম থেকে উঠে সবিতা দেখে একটি ৫ বছরের ছোট কালো ছেলে ওদের উঠানে বসে আছে। ওকে বসে থাকতে দেখে সবিতা ছেলেটিকে কাছে ডেকে বলল, এই 'তোর নাম কিরে? ছেলেটি বলল, গোপাল। নামটা শুনেই সবিতা যেন কেমন চমকে উঠে বলল, তোর জন্যই কি আমি অপেক্ষা করছিলাম, দ্বিতীয় দিনও ছেলেটি আসল, তৃতীয় দিনও ছেলেটি আসল, আবারও আসল। ওকে দেখে সবিতার মাতৃস্নেহ উথলিয়ে উঠল। ছেলেটিকে কাছে ডেকে শরীরের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বলল, আয় বাবা আয় ঘরে আয়, গোপাল মাথা নিচু করে সবিতার হাত ধরে মৃদু পায়ে একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগল। সবিতা ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বলল, 'গোপাল কিছু খেয়েছিস?'

গোপাল মাথা নেড়ে জানাল, না, সে খায়নি। সবিতা আদর করে দু'হাত দিয়ে ওর দু'টো গাল ধরে বলল, আহারে, তাই তো মুখটা এমন শুকনো লাগছে। তুই বোস আমি এখনই তোর খাবার নিয়ে আসছি। এই বলে সে উঠে গিয়ে গোপালের জন্য খাবার নিয়ে এলো। গোপাল যেন কেমন লজ্জা পাচ্ছে, খেতে চাচ্ছে না। সবিতা ওকে আরও কাছে এনে কোলে তুলে নিয়ে খাবারটা দিতে যাচ্ছে। এমন সময় সুরঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, সবু তুই কেন ছেলেটাকে জোর করছিস, খিদে লাগলে ও নিশ্চয়ই খাবে। অন্যের ছেলেকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা দেখানো ভাল নয়।

কে কার কথা শুনে। সবিতার মাতৃহৃদয় গোপালের প্রতি উদ্বেলিত। তাইতো জোর করে ওকে খাইয়ে দিলো। গোপালের কাছে ওর মা বাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করেও সবিতা কিছুই জানতে পারেনি। আশে পাশের লোকজনদের কাছে জানতে চেয়েও কিছুই ফল হয়নি। ছেলেটার ভবিষ্যত ভেবে আবেগপ্রবণ সবিতা আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। এই সুন্দর ছেলেটা এতিম। ওকে দেখার কেউ নেই। তাহলে ভবিষ্যৎ কি হবে?

পরের দিন গোপালের জন্য ভাল ভাল জামা প্যান্ট কিনে আনল। ওকে জামা পরাতে পরাতে সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'গোপাল, তাকাতো আমার দিকে। শোন, তুই আমার সঙ্গে আমার দেশের বাড়ি যাবি?' অকপটে গোপাল স্বীকার করল, হু-তুই সত্যি যাবি? উৎফুল্লভাবে সবিতা জিজ্ঞাস করল। সুরঞ্জন এসে বলল, 'সবু, তুই এটা কি করছিস? ওকে কেন নিবি? এ ছেলে কে? কোন জাতি? কোনো কিছু জানা নেই, সমাজ কি এটা মেনে নিবে? যা করবি ভেবে চিন্তে করবি।'

সবিতা দাদার কথায় আশ্চর্য হয়ে বলল, 'দাদা তুমি এটা কি বলছ? অসহায় ছেলেটাকে আশ্রয় দিব, স্নেহ দিয়ে ওকে মানুষ করবো তাতে তো কোনো দোষ দেখি না।' সুরঞ্জন কিছুতেই সবিতার কথা মানতে রাজী নয়। যেখানে ছেলেটার বংশ, কুল সব কিছু অজানা, সেখানে সমাজ এটা কি করে মেনে নিবে?

কিন্তু সবিতার কথা, আমি মায়ের স্থান থেকে একটা শিশুকে তার বংশমর্যাদা, উন্নত ভবিষ্যৎ দানে চেষ্টা করব। সেটা যদি সমাজ মেনে না নেয় না নিবে। কিন্তু আমি একটা ছেলেকে জলে ফেলে দিয়ে শান্তিতে দেশে ফিরে গিয়ে থাকতে পারবো না। দাদা তুমি অমত করো না, মনে কর আমি ওর সত্যিকারের মা, আর গোপাল আমার ছেলে। শ্রীকৃষ্ণও তো যশোধা মায়ের আদর যত্ন স্নেহ দয়ামায়ায় বড় হয়েছে। আমার গোপালও আমার কাছে বড় হবে। দাদা তুমি আর আপত্তি করো না।

ওরা আগামীকালই এখান থেকে রওনা হবে। আরও একমাস থাকার কথা ছিল তাদের কিন্তু গোপালের জন্যই তারা কালই রওনা হচ্ছে। গোপাল জামা কাপড় পরে খুশিতে আটখানা হয়ে সবিতাকে বলল, মা আমরা কখন বাড়ি যাবো?

গোপালের আগ্রহ দেখে মাও খুশিতে বলে উঠল, দেখ ছেলের আর ত্বর সইছে না। যাবো রে বাপু, তাড়াতাড়িই যাবো। পরের দিনই সবিতারা দেশের বাড়ি জামালগঞ্জ চলে এলো। পাড়ার সবাই দৌড়ে এলো ওদের দেখতে। গোপালকে দেখে সবারই খুব কৌতূহল হলো। সবিতা কোন ছলচাতুরী না করে যেটা সত্য তাই বলল। ছেলেটা অনাথ, ওর অসহায়ত্বের কথা ভেবে সে সইতে পারিনি তাই মাতৃত্বের দাবীতে ওকে বুকে তুলে নিয়ে এসেছি। আমি ভগবানের দান বলে ওকে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। ভগবানই ওকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। সবিতা মনে প্রাণে এটাই বিশ্বাস করে। সমাজের লোকেরা যাই বলুক সবিতা গোপালের মা হয়েই বেঁচে থাকার বাসনা ব্যক্ত করল। তখন থেকে ওর নাম হলো 'গোপাল চন্দ্র রায়' এবং রায় পরিবারের একজন পাকাপোক্ত সদস্য। গোপালকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সবিতার তিন সন্তান একত্রে লেখাপড়া করছে। সবিতা সাধন ও রাধাকে যেমন যত্ন সহকারে পড়াচ্ছে তেমনি গোপালের বেলায়ও তার কোন ত্রুটি হলো না।

গোপালকে পেয়ে সাধন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। সর্বদা গোপালের দোষ করতেই ব্যস্ত। সাধন ভাবে তার একটা শরীক হলো। সাধন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, রাধা আর গোপাল কলেজে পড়ছে। সাধন ভাল ছাত্র। সংসারে কোন অভাব নেই। মায়ের আদরে ও যত্নে সংসারটা আরও সুখময় হয়ে উঠছে। গোপালের ইচ্ছা সেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। সাধনের চেয়েও গোপাল ভাল ছাত্র। সেটাও সাধনের একটি হিংসার কারণ। ছোটকাল থেকেই সাধন গোপালের সাথে এমন ব্যবহার করে আসছে। শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে এলো যে সে গোপালকে দু'চোখে দেখতে পারল না। সাধন পড়াশুনা শেষ করে বিদেশ যাবে বলে মাকে জানাল। মা কখনও চায়নি, তার ছেলেরা বাইরে চলে যাবে, সাধন না থাকলে কাকে নিয়ে থাকবে। সবিতা কেঁদে কেঁদে বলে, কি বলিস বাবা, তুই চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব? এক মুহূর্ত দেরী না করে তড়িৎগতিতে সাধন জবাব দিল, কেন মা তোমার তো ছেলে আছেই, তোমার আপন ছেলে গোপাল, সে তো আর যাচ্ছে না। কথাটা শুনে মায়ের পা দু'টো যেন কেমন অবশ হয়ে এলো। ওখানেই স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়ল। মেয়ে রাধা দৌড়ে এসে মাকে ধরে বলল, মা তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে? রাধা ও গোপাল দু'জনে ধরে মাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। দাদার ব্যবহারে গোপাল মনঃক্ষুন্ন হলেও কিছু বলার মত ক্ষমতা তার ছিল না, তাই চুপ করে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। সাধন জিদ ধরেছে, সে বিদেশে যেয়ে লেখাপড়া করবে। এমন জেদি ও বদমেজাজি ছেলে যে, মায়ের মনের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না, তার ভাবখানা এই বাবার পরেই এ বাড়িতে তার স্থান, অন্য কারও কথা গ্রহণযোগ্য নয়। নাইবা হলো তবুও মাকে তো সংসারে উপযুক্ত সম্মান দিত হবে, তাকে তো অবহেলা করা যাবে না। সংসারে এমন অশান্তির মধ্যে সবিতার বারবার মনে হতে লাগল শ্বশুর- শাশুড়ি ও স্বামীর কথা। এরা বেঁচে থাকলে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। সাধন নিজের মায়ের পেটের বোনকেও সহ্য করতে পারত না। মাকে বলেছিল তুমি যে ঝঞ্ঝাট নিয়ে এলে, এখন বড় হয়েছে লেখাপড়া শিখছে। বিয়ে করাতে হবে তো! মা বললেন, তা আগে থেকে ঠিক আছে। ভগবান সব ঠিক করে রেখেছে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। সাধন রাগত সুরে বলল, 'সবই বুঝলাম কিন্তু সে পাত্রী কে? মা খুশি হয়ে বলল, 'কেন তুই জানিস না, আমি তো রাধার সঙ্গে গোপালের বিয়ে ঠিক করে রেখেছি।' মায়ের কথা শুনে সাধন চিৎকার করে হাততালি দিতে দিতে বলল, বাঃ বাঃ মা তোমার চিন্তা শক্তিও বেশ প্রখর। যাক তুমি যা খুশি তাই কর। আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে এসো না।'

সবিতা ছেলের কথাতে তার মনোভাব বুঝতে পারল। মা আর কথা না বাড়িয়ে পাড়ার আর দশজন মাতব্বর গোছের লোক ও আত্মীয় স্বজনদের ডেকে গোপাল ও রাধার বিয়ে ঠিক করে ফেলল এবং ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে ওদের বিয়েও হয়ে গেল। সাধন বোনের বিয়ে কিছুতেই মানতে পারেনি। কোথায় বোনকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করিয়ে উচ্চবিত্তের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিবে। বিদেশে সুখে থাকবে, তা না করে মা বোনটাকে চালচুলাহীন এক কুলহীন ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিল নিজের সুখের জন্য। এতে সাধন দুঃখ পেয়ে তাড়াতাড়ি মা, বোনকে দেশে রেখে বিদেশে পাড়ি জমাল। এদিকে শত দুঃখের মধ্যেও মা তার দুই সন্তান গোপাল ও রাধাকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে সবিতা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এদিকে গোপালের দু'সন্তান হয়েছে ছেলে দীপঙ্কর ও মেয়ে দীপান্বিতা। ওদের দিকে

তাকিয়ে মা আস্তে আস্তে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে। রাধা এত শান্ত যে কষ্টের কথাও কখনো মুখ ফুটে বলবে না।

ইতোমধ্যে সাধন লন্ডনে গিয়ে এক মেমকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। আর মাকে জানিয়ে দিয়েছে সে আর দেশে ফিরবে না। মা যেন তার নিজের ছেলে গোপালকে নিয়ে ওখানে সুখে শান্তিতে থাকে।

মমতাময়ী মা সবিতাকে ছেড়ে গোপাল এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। গোপালের কাছে মা যেন সাক্ষাৎ 'মা দূর্গা'। তিনি দশ হাতে সংসার সন্তানদের আগলে রাখেন। গোপাল মমতাময়ী মা সবিতাকে ছাড়া কিছুই যেন ভাবতে পারেন না। একমাত্র মায়ের জন্যই সে এ পৃথিবীতে আছে। তার কাছে মাতৃহীন জীবন যেন অর্থহীন। মায়ের স্নেহ ছায়াই যেন তার একমাত্র অবলম্বন। সবিতাও তাই ভাবত যে, গোপাল কোন জন্মে যেন তারই পুত্র ছিল। তাইতো এ জন্মে এসে ওদের আবার মিল হলো। এ যেন বিধাতার লীলা।

মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে গোপাল বিছানা হাতিয়ে দেখে রাধা নেই। ভাবল উঠে সংসারের কাজ করছে। রাধা চিরকালই মুখচোরা, কখনও মনের কথা অকপটে প্রকাশ করতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুই প্রিয়জনদের সাথে ভাগাভাগি করতে জানে না। এমন টাইপের লোকেরা নিজেরাও সুখী হয় না এবং অন্যকেও সুখী করতে পারে না।

আস্তে আস্তে বেলা উঠতে লাগল, কিন্তু রাধার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। গোপাল এমনিতে একটুতেই কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। তার উপর এতবড় বিপর্যয়। সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বাচ্চাগুলো মায়ের জন্য কাঁদছে মা- সন্তানের জন্য হাঁ পিত্যেশ করছে। স্বামী স্ত্রীর জন্য ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায় গোপালের কী করা উচিত সে কী করবে?

এ ঘটনায় পাড়ার লোক এবং আত্মীয় স্বজনরাও অবাক হয়ে গেছে। কেন এমন হলো? কেউ কোন কারণ খুঁজে পায় না। তবুও পাড়া থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জ সর্বত্র খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনো হদিস পাওয়া যায় না, বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এমন মায়াভরা চেহারায় মলিনতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

একদিন সকাল বেলা পাড়ার লোকেরা দেখলো রায়বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা, তারা অবাক হয়ে গেল, এমন তো কোনদিন হয় না। ও বাড়ির দরজা কোনদিনও এমন হাট করে খোলা থাকে না। বাড়ির সামনে আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল, পাড়ার সব লোক এসে জড়ো হয়েছে। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে দারোগা পুলিশও এসে গেছে। ওরা এসে ঘরগুলো দেখে নিয়ে ঘরে সিলগালা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। পাড়ার লোকেরাও বলাবলি করতে লাগল, এত ভাল মা ঠাকুর কেন চলে গেল? কোথায় গেল? আর কি আসবে না! ওদের যেন মঙ্গল হয়।

অভিনন্দন অভি

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে মানুষ ও প্রকৃতি একেবারে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বৈশাখের মাঝামাঝিতে এত গরম, ভাবা যায় না। গরমে ছটফট করতে করতে আমার ভাড়াটিয়ার ছেলে অপু ও মনা এসে বলল: দিদা আমরা একটু বাইরে যাই আদালতের মাঠে আমরা খেলতে যাই?

জিজ্ঞেস করলাম, কে কে যাবে?

ওরা বলল- আমরা দু'জন, খোকন, বুড়া, টুকু, অভি, অশুরা দেখি আর কে কে আসে। আমি ভাবলাম, যাক গরমে মাঠে থাকলে একটু ভালও লাগবে, তাই ওদের যেতে বললাম। আমি ঘরে বসে সেলাই করতে লাগলাম। আমারও গরমে ভাল লাগছে না। তাই আমি একটা পত্রিকা হাতে করে নিয়ে মাঠে গিয়ে পূর্ব দিকের গাছতলায় বসে পড়তে লাগলাম। ছেলেগুলো আনন্দে খেলছে, তাই খুব ভাল লাগছে। ওরা খেলছে, আমি পড়েছি, তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ঈশান কোনে কালো মেঘ করে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে উঠল।

ছেলেগুলোকে তাড়া দিয়ে মাঠ থেকে নিয়ে অভিদের বাড়িতে উঠেছি। অভিদের বাড়িতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো। ঘরে দরজা বন্ধ করে ছেলেদের বললাম, তোমরা চুপ করে বসে থাক। ঝড় থামলে বাইরে যাবে।

অভি ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলল, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমার বাসায় দীপ্ত ঘুমিয়ে আছে, ওর মা ও আপা দু'জনে মার্কেটে গেছে। যাওয়ার সময় বলে গেছে, আমরা যেন দীপ্ত এর খোঁজ নেই। ছোট ছেলেটি এই ঝড়ের মধ্যে ভয়ে কেঁদে কেটে মরেই যাবে। চল।

ঝড়ের মধ্যে কি করে বের হই, তখন ঝড়ের দাপট প্রচণ্ড। এদিকে একলা ঘরে দু' বছরের শিশু কেমন আছে, কি করছে? - এটাও চিন্তার বিষয়। দীপ্ত ঝড় বৃষ্টির শব্দে জেগে উঠে কিছু দেখতে না পেয়ে চিৎকার করেও কোন কূলকিনারা পাবে না, ও তো এমনিতেই মরে যাবে। আবার ঝড়ের মধ্যে বের হওয়াও মুস্কিল।

এমন সময় ঝড়ের মধ্যে শুনতে পেলাম মটমট করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে তাতে আমিও ভয় পেলাম। ঐ শব্দ শুনে মনা, অপু, বুড়া, খোকন , টুকু, অভি, অন্তরা আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল। আমি কি করব। ভেবে উঠতে পারছি না। তখন অভির বাবা বলল, 'এখনই ঝড় থেমে যাবে আমরা সবাই যাবো। তোমরা এত ভেবো না।'

ঝড় আস্তে আস্তে কমতে লাগল আমরাও দীপ্ত এর জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। আর ওর মা ও মনার মাকে বকতে লাগলাম, কেমন মা ওরা একটা ছোট্ট শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়িতে ফেলে রেখে কেনা-কাটা করতে এ যায়? ওদের ভাবা উচিত ছিল, কাজটা মোটেই ওরা ঠিক করেনি। অভি আরও ভয় পেয়ে বলল, দীপ্ত এর কিছু হবে না তো? দীপ্ত ভাল আছে তো বলেই কাঁদতে আরম্ভ করল।

অভির বাবা বলল, একি অভি! তুমিতো এমন ছেলে নও, একটুতেই তো তুমি কাঁদার ছেলে নও! চল তোমাকে নিয়ে দীপ্তদের বাড়ি যাই। বাবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অভি দরজা খুলে বের হচ্ছিল। ওর বাবা বলল, বিপদে ধৈর্য হারা হয়ো না। ঝড় এখনই থেমে যাবে। আমরা দীপ্তকে সুস্থ অবস্থাতেই পাবো।

ছেলেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, দীপ্ত যেন সুস্থ থাকে ভাল থাকে। ঝড় থেমে গেলে আমি ওদের সঙ্গে নিয়ে দীপ্তদের বাড়িতে রওনা দিলাম। পার্শ্বের বাড়িটাই দীপ্তদের বাড়ি। গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম, একি এতবড় ডাল ভেঙে পড়েছে, দীপ্ত কি বাইরে এসেছিল? উৎকণ্ঠায় আরও অস্থির হলাম। অভির বাবা দা দিয়ে ডাল কেটে বাড়ির ভিতরে ঢুকার রাস্তা বের করে দিল। অভি বাড়ির ভিতরে ঢুকে আনন্দে দীপ্তকে ডাকলো আর আমাদের ডেকে খুশিতে বলে উঠল, ঐ দেখ আলো জ্বলছে দীপ্ত ভাল আছে।

আমরা সবাই আস্তে আস্তে ঘরে ডুকে দেখলাম,

দীপ্ত খাটে বসে আছে। অভি দৌড়ে গিয়ে দীপ্তকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে কেঁদেই ফেলল। তখন অভি বলল, দীপ্ত এর মা আমাকে বলে গিয়েছিল, দীপ্ত ঘরে আছে ঝড় হওয়াতে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। বারবার মনে হচ্ছিল, এটা কি হল? আমি এটা কি করলাম। একটা ছোট বাচ্চার জন্য আমি কিছু করতে পারলাম না? আমার দায়িত্বহীনতার জন্য ছেলেটার ক্ষতি হবে। এসব ভাবতে ভাবতে বাবা আমি অস্থির হচ্ছিলাম।

অভির ভাবাবেগ দেখে আমরা বড়রা সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। কারণ ৬ বছরের একটি শিশুর এত দায়িত্বজ্ঞান কর্তব্যবোধ কোথা থেকে হলো।

আমি বললাম, ছেলে মেয়েরা শোন, অভির কর্তব্যজ্ঞান, দীপ্তর সুস্থ থাকা এবং আমাদের আনন্দের জন্য আমরা আগামীকাল শুক্রবার উৎসব করব। পাড়ার অন্যদের সঙ্গে নিয়ে আমরা হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দ করব। সবাই রাজিতো?

ওরা সাবই জোরে চিৎকার করে বলল, রাজি! রাজি! রাজি!

নয়নতারা

কল্যাণ সবচেয়ে ছোট ভাই আমার। অতি আদরের অতি স্নেহের, মিষ্টি মধুর ব্যবহার। চেহারাও সুন্দর। পড়ন্ত বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে আমাকে ডাকতে ডাকতে বলল, দিদি দেখ এসে কি এনেছি। দেরী হচ্ছে আসতে, তাই রাগত ঝংকার করে বলল, ‘আয় না, তাড়াতাড়ি আয়। আমি হাতের কাজ ফেলে এসে দেখি, ও পকেট থেকে একটি বিড়ালছানা বের করে বলল, ‘দেখ কি সুন্দর!, তারপর বিড়ালের বিবৃতি দিতে লাগল। যখন স্কুল থেকে বের হয়ে পৌরসভার ওখানে এসেছি, তখন দেখি কাদা মাখা বাচ্চাটি থরথর করে কাঁপছে, আর কাঁদছে। দেখে আমার খুব মায়া হলো কাদাসহ কোলে নিয়ে পাশের টিউবওয়েলে নিয়ে যেয়ে আলতো করে ধুয়ে আমার রুমাল দিয়ে প্যাচিয়ে পকেটে করে নিয়ে এলাম। বাবা খাবার টেবিলে বসে বিকেলে চা খাচ্ছিল। কল্যাণ এসে বাবার পায়ের কাছে বিড়ালটাকে নামিয়ে দিল। বাবা বলল, ‘ওর একটা নামকরণ কর।’ সমস্ত শরীর শুভ্র, আর মাথায় একদিকে কালো ছোপ। কল্যাণ বিড়ালটাকে ভাল করে দেখে বলল, দ্যাখ দিদি, চোখ দুটিতে কেমন মায়া আর কাজল আঁকা, কি সুন্দর কি নাম রাখা যায়, কি নাম হু? ওর নাম রাখলাম ‘নয়নতারা’। আমরাও দেখলাম কি সুন্দর

চোখ দু'টি। সবাই রাজি হলো ওর নাম নয়নতারাই থাক। পশুপাখীর প্রতি কল্যাণের খুবই দয়ামায়া ছিল। বাড়িতে সে কবুতর রংবেরং এর পাখী পুষতো, কেমন সুর করে যেন কুকুরদের ডাকত, ডাক শুনে ওরা কল্যাণের পায়ের কাছে এসে লেজ নেড়ে নেড়ে কু-কু করে আদর নিতে চাইত। উঠানে কবুতরদের খাবার জন্য গম ছিটিয়ে দিলে ওরা বাকুম-বাকুম করে নেচে নেচে খেত। কল্যাণও ওদের সঙ্গে উঠানে নাচতো।

একদিন টেবিলের নিচে বিড়ালটি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। কল্যাণ কোলে নিয়ে বলল, দ্যাখ দিদি এ কয়দিনেই আমার নয়নতারা কেমন সুন্দর হয়েছে এবং বড়ও হয়েছে।' বাবা বললেন, 'আদর যত্ন পেলে সবাই এমন সুন্দর হয়। ও তো খাওয়া, আদর যত্ন সবই পাচ্ছে। সুন্দরতো হবেই।'

নয়নতারা মনের আনন্দে নাচানাচি ও খেলাধূলা করত। কল্যাণের দাদা বিমানের খাতা (নোটখাতা) নখের আঁচড় দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ছিড়ে দিয়েছে তাই দেখে ওর দাদা নয়নতারাকে মারতে গেল। সে তাড়া খেয়ে ঘরের চালে উঠে বসে রইল। কনকনে শীত। শীতে কল্যাণের দাদা বিমান উঠানের একপাশে চেয়ার নিয়ে রোদে বসে পড়ছে। এদিকে বিড়ালটি ভয় পেয়ে চালের উপরে প্রস্রাব করে দিয়েছে। সে প্রস্রাব বিমানের গায়ে এসে পড়েছে। বিমানতো রেগে গিয়ে বিড়ালকে বকতে লাগল, মারতে গেল-আজ তোকে আমি মেরেই ফেলবো, তোর আর রক্ষা নেই।

একথা শুনে কল্যাণ বলল, দিদিরে এখন কি হবে? আমার নয়নতারাকে মারলে ও তো মরেই যাবে, কি করবো আমি।

আমিও কল্যাণকে খেপানোর জন্য বললাম, 'আমি কি করবো, এমন দুষ্ট বিড়াল না থাকাই ভাল।' আমার কথা শুনে আরও কাঁদতে লাগল। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুমি খাওয়া দাওয়া করে স্কুলে যাও, আমি দেখছি। কিন্তু কল্যাণের মা জানে না। তাই সে বিড়ালকে বাঁচাতে ওকে ব্যাগে ভরে ফেলে দিতে নিয়ে গেল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল, ওকে বাঁচানোর জন্য বড় পুকুরের পাড়ে নিয়ে ছেড়ে দিব ভাবলাম। কিন্তু মোহাম্মদ ভাইএর বারান্দায় বসে আছে কালু ভাই। ওদের দেখে ফিরে এলাম। আবার এদিকটায় এসে দেখলাম বালির ঢিবি। ছেড়ে দিলাম নয়নতারাকে বালির ঢিবির আড়ালে কোথায় চলে গেলো, খুঁজে আর পেলাম না বলেই জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। সেদিন রাতে ছেলেটা না খেয়ে রইল দু' তিনদিন পরে মাঝরাতে কল্যাণ চিৎকার করে উঠল।

দিদি ওঠ, দেখতো পায়ের কাছে কি যেন নরম ঠেকল, দ্যাখনারে, নয়নতারা নয়তো? ঘুম থেকে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দেখি, না, কিছুই নেই, মনে মনে ভাবলাম, কিছুতেই ছেলেটা বিড়াল বাচ্চাটাকে ভুলতে পারছে না। আমি ওকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'তুমি এখন ঘুমো, ওসব চিন্তা করোনা।' তবুও ছেলেটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যায় কল্যাণকে পড়তে বসিয়েছি। এমন সময় বিড়ালের ডাক শুনতে পেয়ে ও দৌড়ে বাইরে বের হলো। আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু কল্যাণ বিড়ালটাকে কোলে করে হাসতে হাসতে আমাকে ডাকছে। সে হাসি যে কি উজ্জ্বল ও পবিত্র। দিদিরে দেখে যা কে এসেছে? আমি তো অবাক হয়ে ওদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। কেমন করে রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে পথ চিনে মনিবের কাছে ফিরে এল। কল্যাণ আনন্দে আত্মহারা নয়নতারাকে ফিরে পেয়ে।

কল্যাণ দুধ খেতে খুব পছন্দ করত। দুপুরে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে নয়নতারা চুলার পাশে ঘুমোচ্ছে। দুধ ভরা কড়াইতে পুরু হয়ে সর পড়েছে দেখে কল্যাণের খুব লোভ হলো। তাই সে সর তুলে খাওয়ার জন্য হাতা দিয়ে সর তুলতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা ওর হাতটা ধরে ফেলল। সে যেন বলতে চাইছে উহ্, চুরি নয়, সর খাবে না। কল্যাণ জোরে জোরে মাকে ডেকে বলল,'ওমা দেখে যাও নয়নতারার কাণ্ড।

আমরা দৌড়ে রান্নাঘরে এসে দেখি নয়নতারা কল্যাণের হাত ধরে চুলোর পাড়ে বসে রয়েছে। ও মা এমন করে চোর ধরতে হয়। ধমক দিয়ে বললাম, ছাড়, হাত ছাড়। ধমক খেয়ে নয়নতারা ওর হাত ছেড়ে, মিউ মিউ করতে করতে বাইরে চলে গেল।

কল্যাণ খুবই স্নেহ প্রবণ ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসেই নয়নতারার খোঁজ নিত। সন্ধ্যার পর সে যখন পড়তে বসত তখন নয়নতারা ওর কোলে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকত। মনে হচ্ছে যেন মাতৃস্নেহের জায়গা সে খুঁজে পেয়েছে।

কোন কোন সময় দু'জনে খেলাও করত, কল্যাণ আঙ্গুল ঘুরিয়ে যে দিকে যায় নয়নতারাও লাফ দিয়ে ওর হাত ধরতে সেদিকে যায়। মা খেতে ডাকছে কল্যাণ ওকে কোলে নিয়েই খেতে গেল। সরস্বতী পূজার বাকী আর মাত্র ৬ দিন।

কল্যাণ যা করত খুব সিরিয়াসলি করত। পূজার কাজ নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত। কার্ড ছাপানো থেকে আরম্ভ করে চাঁদা তোলা, পূজার মন্ডপ তৈরি করা, সাজসজ্জা ও পূজার সমস্ত আয়োজন, সবকিছুই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে মনোযোগ সহকারে করছে।

পূজার ব্যস্ততার জন্য প্রায় ভুলেই গিয়েছিল নয়নতারার কথা। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে এত পরিশ্রম ও রাত জাগাতে কল্যাণের শরীরটাও কিছুটা খারাপ হয়েছে। সর্দি জ্বরে শুয়েই রয়েছে, বেশ বেলা করে উঠে নয়নতারার খোঁজ পড়ল। দিদিকে ডেকে বলল, আমার নয়নতারা কই? দিদিতো জানে সে কোথায়? কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না। শেষে সাহস করে বলল, দেখ নয়নতারা আপন, তাই বলে রোগ তো আপন নয়। নয়নতারা বিছানায় এসে শুয়েছিল, তখন ওকে কাছে আনতে যেয়ে দেখি ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। বাবাকে বললাম কথাটা। বাবা ওকে দেখল। নয়নতারা করুণ চোখে তাকিয়ে ভাঙা গলায় যেন বলতে চাচ্ছে, তোমরা আমাকে বাঁচাও। তারপর ওকে বিছানায় উঠতে দেইনি বলে সে রান্না ঘরের পিছনে ছাই এর গাদায় আশ্রয় নিয়েছিল। এ কয়দিন পূজার ঝামেলায় একটুও খোঁজ নিতে পারিনি।

কল্যাণ রান্নঘরের পিছনে নয়নতারাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে ধরে তুলে নিয়ে আনল। নয়নতারা একটুখানি ঘাড় তুলে অস্ফুট কণ্ঠে মিউ মিউ করে ডাকল। কল্যাণ আর দেরী না করে ওকে পশু হাসপাতালে নিয়ে গেল। পশু ডাক্তার হাত দিয়ে একটু টিপে দেখে বলল, এর সময় ঘনিয়ে এসেছে, বাঁচানো সম্ভব নয়। এ কথা শুনেই কল্যাণ চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল।

ডাক্তারকে বললাম, আপনি মানুষ? অন্যের দুঃখকষ্ট কিছুই বুঝেন না? দেখুন তো ছেলেটার দিকে চেয়ে ওর মুখের চোখের অবস্থা কি? পশুদের দয়ামায়া আছে, আপনি পশুর চিকিৎসা করতে করতে পশুর মত অধম হয়ে গেছেন। ডাক্তার কি একটা ঔষধ দিল, তা খাওয়াতেও পারল না, সবাই নয়নতারাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসল।

বাড়ি এসে কল্যাণ নয়নতারাকে হা করিয়ে ভাল করে দেখে একটি বড় মাছের কাঁটা বের করে আনল এবং তখন মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। কল্যাণ তখন বলল, রোগ ধরা পড়েছে যখন তখন নয়নতারা ভাল হয়ে যাবে। কি করে ভাল হবে, ওর যে সেপ্টিক হয়ে গেছে। সবাই বলছে, ও আর ভাল হবে না। কিন্তু কল্যাণের দৃঢ় বিশ্বাস ভাল হতেই হবে।

ঘরে এনে মেঝের এককোণে নরম বিছানা পেতে কম্বলের টুকরো গায় দিয়ে শুইয়ে দিয়ে ওর পাশে কল্যাণ বসে রইল। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে কল্যাণ নয়নতারার পাশে বসে থাকল, কখনও শরীরে, কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নয়নতারার জ্ঞান আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে। আমরা পাশে বসে বুঝতে পারছি, সে আর বাঁচবে না, কিন্তু কল্যাণের বিশ্বাস নয়নতারা ভাল হয়ে যাবে। সে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে কখন চোখ খুলবে নয়নতারা।

আমরা সবাই খাওয়ার ঘরে এসে বিকালের চায়ের আয়োজন করছি। বাবা বললেন, নয়নতারার অবস্থা এখন কেমন? ছেলেটা সারাদিন কিছুই খায়নি, দুপুরেও ভাল করে ভাত না খেয়ে উঠে গেল। ছেলেটার আবার কিছু না হলেই ভাল। এ কথা শুনে মা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, এমন অলক্ষুণে কথা বোলোনা তো? তখনই সবাই শোয়ার ঘর থেকে অতিকষ্টে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। সবাই দৌড়ে ঐ ঘরের দিকে ছুটে গেল, কল্যাণ কেঁদে কেঁদে বলছে, দেখ তোমরা আমার প্রিয় নয়নতারা কেমন নিথর হয়ে গেল। আমি পূজার জন্য সময় দিতে পারিনি আর তোমরাও ওর কেয়ার নাওনি। আবার চিৎকার করে বলে উঠল, তোমরা নও, আমিই ওকে মেরে ফেলেছি। কেন এমন হলো! আমরা সবাই ওকে ধরে অন্যঘরে নিয়ে গেলাম। সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বাবা বললেন, পৌরসভায় খবর দাও, ওরা এসে নয়নতারাকে নিয়ে যাবে। কল্যাণ কাঁদতে কাঁদতে লাফ দিয়ে নয়নতারার কাছে এসে বলল, 'ওকে কোথাও নিয়ে যেতে দিব না। নয়নতারা এ বাড়িতেই থাকবে।' সবাই মিলে ঠিক করল, ঠাকুর ঘরের পাশে ওকে সমাহিত করা হবে। করাও হলো তাই।

কল্যাণ ওর পাশে বসে কেঁদেই চলছে। বাবা বলল, ‘পৃথিবীতে অবিনশ্বর বলতে কিছু নেই, তোমার নয়নতারাও তার বাইরে নয়। এসো বাবা ঘরে এসো।’

কল্যাণকে হাত ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললাম, একটু ঘুমোতো ভাই। ওর পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। আর ভাবলাম এত মায়া এইটুকুন ছেলে কি করে লুকিয়ে রেখেছে। চাদরটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে, পা টিপেটিপে ঘর হতে বের হয়ে এলাম।

কোন কাননের ফুল

সকালে রাস্তাটা এত নিরিবিলি, নিশ্চুপ শান্ত যে মোহাবিষ্ট হয়ে সুতপা হেঁটে চলছে। সে মেইন রোড পার হয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরল, মোড়ের পরেই কলেজ রোড। কলেজ রোডে ঢুকে মৃদু পায়ে হাঁটছে আর মনে মনে ভাবছে পুরুষশাসিত সমাজের কথা, এ সমাজে নারীদের মর্যাদা কোথায়? কতখানি অগ্রগতি হয়েছে নারীর? হাঁটতে হাঁটতে সুতপার প্রিয় বান্ধবী জোহ্‌রার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। অনেক দিন হয় ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। জোহ্‌রা সুতপার স্কুল জীবনের প্রিয় বান্ধবী। আজকাল মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু কতটুকু সেটা? সত্যিই কি এগিয়েছে? একটা মেয়ে কি একটা ছেলের মত সম্পূর্ণ একাকী চলতে পারছে? প্রথম জীবনে বাবা, তারপর স্বামী ও সর্বশেষ পুত্রের আশ্রয়ে থাকতে হয়, এটাই যেন নারীর একমাত্র ভবিতব্য। সারা জীবন এভাবে থাকতে না পারলে বা পুরুষের পূর্ণ কর্তৃত্ব মেনে নিতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ কি?

সুতপার ধারণা পুরুষরা অত্যাচারী। মেয়েদের মনের দিকে না তাকিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখে। সুতপার মনে এই ভাবের উৎপত্তি হয়েছে পারিবারিক সমস্যা থেকে। সুতপার বাবা অনুপম মিত্র একজন নির্দয় ও নিষ্ঠুর লোক ছিল। আর সুতপার মা অনুপম মিত্রকে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো। তার সামনে সাধারণ কথাও বলতে পারত না। এই পরিস্থিতি থেকেই সুতপাও পুরুষ মানুষ দেখলেই কেমন অপ্রস্তুত ও আড়ষ্ট হয়ে যেত।

সুতপাও ওর মাকে ফেলে রেখে ওর বাবা আবার বিয়ে করে অন্যত্র বসবাস করছে। মায়ের প্রতি সুতপার ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। নারীদের যারা শ্রদ্ধা করতে পারে না, তারা ভালোবাসতেও জানে না। শ্রদ্ধার মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে ভালোবাসার বীজ।

সুতপা মামার বাড়িতে মামা মামীর আশ্রয়ে বড় হচ্ছে। মামারও একটি মেয়ে আছে, সুতপার দু' বছরের ছোট। তার নাম দীপা। দুবোন আদর যত্নে একই সংসারে বড় হতে লাগল। সুতপা দেখতে যেমন সুন্দর ব্যবহারটাও তেমনি মধুর, লেখাপড়ায় সে খুব মনোযোগী এবং ছাত্রীও ভাল। কো- এডুকেশন কলেজে পড়ছে, কিন্তু ছেলেদের গায়ে পড়া ভাবটা সে কিছুতেই পছন্দ করে না, তবুও ছেলেরা নানা কাজে কাছে টানতে চাইত। ওদের সঙ্গে একত্র কোন কাজ করলেও সহজে ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলেনি সুতপা। এটাই ছেলেরা পছন্দ করত না। ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া করতে এসেছ অথচ তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখাবে না, - এ কেমন কথা?

প্রায়শ প্রতিটি কলেজে দেখা যায় বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে মেয়েরা মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করে। এখানেও তাই হয়েছে। ওরাই গঠন করে ছাত্র সংসদ। ওদের নেতৃত্বেই কলেজ পরিচালিত হয়। ওদের নেতার নাম অনিমেশ দাস। ওদের বিরুদ্ধে ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। সুতপা প্রতিবাদ না করলেও ওদের কার্য-কলাপ পছন্দ করত না।

সে ওদের গ্রুপভুক্ত নয় বলে ওদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে না বলে একদিন ছাত্রীরা ওকে ডেকে এনে নানা কথা শুনিয়ে দিল। সুতপা এতে অপমান বোধ করে বলল, আমি এগুলো পছন্দ করি না। তাই আমাকে আমার মত থাকতে দাও। ওরা খেকিয়ে উঠল, না তা হবে না- বেশ, বলে সুতপা ওখান থেকে চলে এলো।

কলেজের বখাটে মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে মাতামাতি করে এবং অন্য শান্ত নিরপরাধ মেয়েদের নানাভাবে নির্যাতন করে তখন সুতপা নির্যাতিত মেয়েদের পক্ষে দাঁড়ায়। এভাবেই গড়ে উঠে একটি প্রতিবাদী গ্রুপ। যখন দেখল প্রতিবাদী গ্রুপ, ওদের মোকাবেল করতে সক্ষম ও প্রস্তুত। তখন ওরা একটু পিছিয়ে এলো। পরবর্তীকালে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সুতপার নেতৃত্বে সাধারণদের বিরাট একটি গ্রুপ প্রতিবাদীদের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনিমেশের গ্রুপ পাল্লা দিতে এখন সাহস পাচ্ছে না। কারণ ওদের যুক্তি জোড়ালো ও যুক্তি সঙ্গত। নারীগ্রুপের নারীরা অধিকাংশই মেধাবী। ওদের দলের নাম দিয়েছে "নারী মুক্তি দল"। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেয়েরা সেখানে অংশগ্রহণ করছে। তাদের ধারণা নারীরা আশ্রয়, নারীরা শক্তি, নারীরা মমতাময়ী, কল্যাণময়ী। আমরা নারী, আমরা সব পারি, নারীমুক্তি দলের স্লোগান শুনে অন্য সাধারণ ছাত্রীরা নারী পতাকাতলে একত্র হয়ে স্লোগানে স্লোগানে কলেজ প্রাঙ্গন মুখরিত করে তুললো। সাধারণ ছাত্রীদের মনে একটা উৎফুল্ল ভাব যেন তারা একটি প্ল্যাট ফরম পেয়েছে। কথা বলার মত জায়গা তৈরি হয়েছে।

কলেজে ছাত্র- ছাত্রীদের কল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কাজে সুতপার গ্রুপ সর্বদাই এগিয়ে যায়। ওদের কার্যকলাপে প্রগতিশীল অধ্যাপকরা ওদের সমর্থন দিয়েছে। বিরোধীদের এটাও একটা হিংসার কারণ। সুতপার মামা রঞ্জন সেন এজন্য খুবই চিন্তায় থাকে।

বর্ষাকাল। প্রচণ্ড বৃষ্টি। অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুতেই বৃষ্টি থামছে না। এদিকে সুতপার বাড়ি আসার নাম নেই। কলেজে গণ্ডগোল হচ্ছে। এ কথাটা শুনে রঞ্জনসেন সুতপার জন্য চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। বারবার ঘরবার করছে। মামা বুঝতে পারছে না কি করবে, একবার ভাবল ছাতা নিয়ে যাই, দেখি গিয়ে। যাবার উপক্রম করতেই উঠানে তাকিয়ে দেখে ৪/৫ জন ছাত্রী নিয়ে সুতপা ভিজতে ভিজতে বারান্দায় এসে উঠেছে। ওদের দেখে মামা-মামি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওদের ধরে ঘরে নিয়ে এলো। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিল। মামা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, দেরী হলো কেন? কি হয়েছে? বলল না মামী ধমক দিয়ে বলল, এখন চুপ করো, মেয়েগুলো ক্লান্ত, কাপড় চোপড় ভিজে গেছে। ওগুলো ছেড়ে, গরম চা খেয়ে শান্ত হোক, তারপর শুনো। মামি ওদের চা জলখাবার তৈরি করে যত্ন করে খাওয়ালো। সুতপার অন্তরঙ্গ বান্ধবী জোহুরা মামীকে আগে থেকেই চেনে, সে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে সুতপার সঙ্গে আসে।

সুতপার মতের সঙ্গে জোহুরার মতের খুব মিল। তাই দু'জনের বন্ধুত্বও গভীর। একটু অবসর পেলেই দু'জনে একত্র হবে। কোন সমস্যার আলোচনা করবে, গল্পের বই পড়বে। কলেজেও দুজনে একসঙ্গে থাকে।

মামার যথেষ্ঠ আদর-যত্ন ভালোবাসাতেও সুতপার পুরুষদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা বিলীন হয়নি। ওর কাছে মামা আলাদা। তার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার সঙ্গে অন্যকারও তুলনা হয় না। মামা-মামাই।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ও সুতপা নারী নেতৃত্বে সম্পৃক্ত ছিল। সেখানেও ছেলেদের সঙ্গে তার বন্‌ত না। তার বক্তব্য কার্যকলাপ কিছুই ছেলেদের সঙ্গে ভাগাভাগি করত না। নারীদের সামাজিক মর্যাদা, সম্মান, অধিকার, ন্যায্যতা এসব কিছু এখনও তার বিরাট চ্যালেঞ্জ।

মামা-মামির বয়স হচ্ছে, নিজের মেয়ে ও ভাগ্নীটাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুঝতে চায়। কিন্তু কিছুতেই সুতপা বিয়েতে রাজি হয় না। তার কেবল ছোট বেলার কথা বেশি করে মনে পড়ত। বাবা কখনও ওর মাকে শান্তি দেয় নি। কথায় কথায় মারধর করত। ছোট্ট বেলায় এমন নিষ্ঠুরতা দেখে দেখে ওর মনটাই অন্যরকম হয়ে উঠেছে। অপমান, অবহেলায় থাকতে থাকতে একদিন মা মরেই গেল, সুতপার ধারণা মাকে বাবাই মেরে ফেলেছে। এখান থেকেই সে নারীবাদী হয়ে ওঠে। তারপর থেকেই সুতপা মামার কাছে।

সুতপা এম. এ. পাশ করে শহরেরই একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছে। বড় কলেজ, অনেক ছাত্রছাত্রী, কলেজের যথেষ্ট সুনাম। সুতপা স্টাফরুমে বসে নোট তৈরি করছিল। কলেজেরই অন্য একজন অধ্যাপক নূর মহল বেগম এসে বলল, সুতপা, একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুতপা ভিজিটিং রুমে গিয়ে দেখল, সত্যিই একটি লোক সুতপার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সুতপা নমস্কার দিয়ে বসতে বলল।

- আপনার নাম?

- অভিজিৎ বসু

- পেশা?

- চিকিৎসা।

- আচ্ছা, বলুন কী প্রয়োজন?

লোকটা কাঠখোট্টা প্রশ্নবাণে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, বলল, গত পরশুদিন ভাসানী হলে রেডক্রস এর যে বিচিত্র অনুষ্ঠান হলো, সেখানে আপনার কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে আপনার পরিচালনায় যে অনুষ্ঠানটি মঞ্চায়িত হয়েছে সেটা চমৎকার প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক হয়েছে। সেজন্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

সুতপা হেসে বলল, এতই ভাল লেগেছে?

হ্যাঁ, ভাল জিনিস সবসময়ই ভাল এবং তার কদরও থাকে।

বলে খাওয়ার উদ্যোগ নিল অভিজিৎ।

অভিজিৎ চলে যাওয়ার একটু পরই অধ্যাপক নূরমহল এসে জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে রে?

- কে তা আমি কি করে জানব? বলল পেশায় ডাক্তার, ফাংশন দেখে খুশি হয়েছে তাই ধন্যবাদ জানাতে এসেছে। এইটুকুনই।
নূরমহল বেগম সুতপার কাছে এসে অন্তরঙ্গ হয়ে জিজ্ঞেস করল,
- এই চেহারাটা কেমন?
- যেমন খুশি তেমন থাক! চেহারা দিয়ে কি হবে?
মামা সুতপার বিয়ের চেষ্টা করছে। কিন্তু সুতপা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। সুতপার মামার মেয়ে দীপা ওর দু' বছরের ছোট। তাকেও তো বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কিছুতেই সুতপাকে বিয়েতে রাজি করাতে পারছে না। মামা ওকে বোঝাল, তুই যদি বিয়ে না করিস তবে তোর ছোট বোনকে কি করে বিয়ে দিবো?
- মামা তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। দীপাকে বিয়ে দিয়ে দাও।
মামা সুতপাকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়ল, কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। মামি অবশেষে বলল, সুতপা যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছে না তখন দীপাকে বিয়ে দিয়ে দাও। বাধ্য হয়ে সুপাত্র দেখে মামা মামি দীপাকে বিয়ে দিয়ে দিল।

ডা. অভিজিৎ মাঝে মাঝে সুতপাদের বাড়ি আসত। নানা আলোচনা ও কথাবার্তায় ওদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দীপার বিয়ে হয়েছে দুবছর হলো। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে। অভিজিৎকে দেখে দীপার খুব ভাল লেগেছে। দিদির এক বন্ধু জুটেছে দিনগুলো ভালই কাটছে। দীপা রঞ্জন সেনকে বলল, বাবা, দিদির সঙ্গে ডাক্তার দাদার বিয়ে হলে কেমন হয়? রঞ্জন সেন বলল, বলে দেখ, তোর জেদি দিদি রাজি হলে তো?
- বাবা আমি চেষ্টা করে দেখবো।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশটাকে আবির রঙে রাঙিয়ে সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে।
এমন সময় অভিজিৎ এলো-
-এই এলাম,
জানালার গরাদ দিয়ে তাকিয়ে দেখল সুতপা। একটু হেসে মুখটা ভিতরের দিকে বাড়িয়ে অভিজিৎ বলল, আসবো-
- এত ভণিতা না করে এসে পড়ুন।
- যাক অনুমতি পাওয়া গেল। তিনটা বছর পার হয়ে গেল।
তবুও 'আপনি' আপনি' বলা ছাড়তে পারলে না তপা আমি তো আশা করে আছি, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনি না ছাড়বে ততক্ষণ আমিও প্রাণ খুলে মনের কথা অকপটে বলতে পারবো না। যাক তোমাকে একটা খুশির খবর দেই- আমার প্রমোশন হয়েছে এবং বদলিও হয়ে যাচ্ছি।
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আচমকা আঘাত পেয়ে সুতপা নিজের অজান্তে অভিজিতের হাত ধরে বলল, একি বলছ তুমি? কি হবে তা হলে? অভিজিৎ সুতপার হাতটা আলতো করে ধরে বলল, কি হবে?- মানে? কার কি হবে? আমার কি পিছুটান আছে? হ্যাঁ..... হ্যাঁ....... আছে আছেই তো। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারনি-বলেই কেঁদে ফেলে মুখ নিচু করে রইল সুতপা। অভিজিৎ ওর মুখটা উচু করে তুলে ধরে বলল, কেন আমাকে এতদিন এমনি করে কষ্ট দিলে তপা? তুমি তো আমার তপা, একান্ত আমার। এই বলে অভিজিৎ সুতপাকে আদর করে বুকে টেনে নিলো। দু' জনের দুঃখ আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।
পরেরদিনই অভিজিৎ সুতপাদের বাড়ি এলো, এসেই ছোট বাচ্চার মত বলে ফেলল, আমি আর থাকতে পারলাম না, তাই এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম। থাকতে পারলাম না তা ঠিক, তুমি আমাকে থাকতে দিলে না। এতদিন যা হয়েছে। সে হয়েই গেছে, এখন মামাকে সব বল।
সুতপা যত দুর্বলই হোক না কেন? সে দৃঢ়চেতা মেয়ে। সে বলল, আমার কতগুলো শর্ত আছে, সেই শর্তে যদি রাজি থাক তাহলে কোন আপত্তি থাকবে না, অভিজিৎ অট্টহাসি দিয়ে বলল, 'শর্তটত' আমার কাছে কিছু নয়, এই তিন বছরে তুমি আমাকে এই চিনেছ? আরও যদি পরীক্ষা করার কিছু থাকে, করে নাও। আরও কাছে এসে বলল, হে দেবী সারাজীবন যেন তোমারই হয়ে থাকতে পারি। আমার মনে হয় আর পরীক্ষা নেওয়ার কিছু নেই। তোমার

প্রিয়তম সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চল পার্ক থেকে একটু ঘুরে আসি। দু'জনেরই ভাল লাগবে। চল চল ।

মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বিপুল উৎসাহে ভাগ্নীর বিয়ের আয়োজন করলো। সুতপা বলল, মামা সাধারণভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করো। আড়ম্বহীনভাবে ওদের বিয়ে সম্পন্ন হলেও আনন্দের কমতি ছিল না। দু'জনকে মানিয়েছে। অভিজিৎ উচা- লম্বা, টকটকে গায়ের রং। মাথা ভর্তি চুল সব মিলিয়ে সুপুরুষ। আর সুতপাও কম সুন্দরী নয়। সবাই অভিজিৎ সুতপার জুটি দেখে খুবই খুশি হয়েছে। যেন হর- পার্বতী।

ওদের বিদায় দিয়ে মামা-মামি শোকাতুর হয়ে পড়ল। সুতপা ওদের সংসার চালাত। মামা মামির খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা সবকিছুই রুটিন মাফিক চালাত সুতপা। এখন ওর অবর্তমানে মামা- মামি যেন আকুল পাথারে পড়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরেই সুতপা শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে এলো। এসে মামা- মামির বাড়িতে কয়েকদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে নতুন সংসার পেতে ঘর করছে। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে সুতপার যে ধারণা ছিল তা প্রতিনিয়তই পাল্টে যেতে থাকে। পুরুষ মানুষ যে শুধু নির্দয় নিষ্ঠুর নয়, একজন যে মহান, দয়ালু ও প্রেমিকও হতে পারে। স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করতে পারে, অপরিসীম ভালোবাসতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, সেটা সুতপা বিয়ের পর জানতে পারল। অভিজিৎ যেখানে বেড়াতে যেত সুতপাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। সুতপাহীন জীবন অভিজিৎ এর কাছে অর্থহীন। স্বামীর ব্যবহার যে এত মধুর হয় সুতপা আগে কখনও কল্পনা করতে পারেনি। সুতপার মনে হয় ভগবান যেন স্বর্গের দূত পাঠিয়েছেন।

দাম্পত্য জীবনের প্রথম হোলি উৎসবের আয়োজন করে সুতপা, তাও আবার অভিজিৎকে না জানিয়ে। ডাক্তার বাবু হাসপাতাল থেকে দু'টোর দিকে ফিরবে, এটা সুতপার জানা। ডাক্তার বাবুর ফেরার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত পাড়ার ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুতপা অপেক্ষা করছিল। বালতি ভরে রং গুলে দোতলার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিল। ছেলে-মেয়ে অভিজিৎ এর আসার অপেক্ষায় অন্যপাশে লুকিয়ে ছিল। সেদিন রং খেলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে সুতপা অভিজিৎকে ধূতি ও পাঞ্জাবী পরিয়ে দিয়েছিল।

দোতলার সিঁড়িতে দু' এক ধাপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে ছেলেগুলো সংকেত দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুতপা দোতলা থেকে রং এর বালতি ডাক্তার বাবুর মাথায ঢেলে দিল। ছেলেমেয়েগুলো হৈ হৈ করতে করতে রং নিয়ে এগিয়ে এলো। অবাক ডাক্তারবাবু!

এমন কথাতো ছিল না। সবাই মিলে আনন্দে হৈ হৈ করে রং খেলে যার যার বাড়ি চলে গেল। ডাক্তার বাবু সুতপার হাত দুটি ধরে বলল, সবাই রং খেলে হৈ হুল্লোড় করে আনন্দ করে চলে গেল। এখন তোমার কি হবে? সুতপা পাশেই আবির রেখেছিল সেটা আনতে আনতে বলল, কি আবার হবে? কিছুই হবে না, কিন্তু অভিজিৎ কি ছাড়ার পাত্র। দেখ না কি হয়? বলেই সে আষ্টেপৃষ্ঠে সুতপাকে জড়িয়ে ধরল। সুতপা অযথাই নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল। ছাড়াতে তো পারলই না উপরন্তু রং মেখে কিম্ভূতকিমাকার হলো। আবির হাতে নিয়ে সুতপা স্বামীর পায়ে দিয়ে প্রণাম করল।

- একি করছ?

- কি করছি আবার? তুমি আমার কে হও জানোনা?

তুমিতো আমার সাত জন্মের স্বামী- দেবতা।

-হু- বুঝলাম, আর তুমি? তুমি আমার কে?

- আমি-আমি- তোমার অর্ধাঙ্গিনী।

- না- না অর্ধাঙ্গিনী নয়। সর্বাঙ্গ বলে হাসতে হাসতে দু'জনে হাত ধরে দোতলায় উঠে গেল।

এভাবেই সুখে দুঃখে যে আনন্দে দিন কাটছিল ওদের।

এর মধ্যে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। সুতপার বান্ধবীরা কেউ কেউ শ্বশুরবাড়ি, আবার কেউ কেউ চাকরি ক্ষেত্রে। তবে দেখা না হলেও সুতপা খোঁজখবর রাখে।

অন্তরঙ্গ বান্ধবী জোহুরা এতদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশ ছিল, সবে দেশে ফিরেছে। এসেই সুতপার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ল, বিকেল বেলাতেই বান্ধবীর বাড়িতে চলে এলো। কলিংবেল বাজাতেই দারোয়ান এসে সদর দরজা খুলে দিল। জোহুরার কাছে বাড়িটা যেন কেমন নীরব নিস্তব্ধ মনে হলো, সামনের দিকে তাকাল, দেখল সুতপা শ্বেত শুভ্র থান কাপড় পরিহিতা,

নিরাভরণ দেহ, কোলে ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে দোতলার সিঁড়িতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। জোহুরা অপলকনেত্রে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে চিৎকার দিয়ে উঠল- সুতপা সুতপা।